বাসা বাঁধার বৃত্তান্ত

ড. দীপচন্দন চক্রবর্তী
অধ্যাপক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
আশুতোষ কলেজ
deepchandan.chakraborty@asutoshcollege.in

আগামী প্রজন্মের প্রতি

ছোট ছিলাম তখন, বনে বাদাড়ে ঘুরে, গাছে চড়ে, হাঁটু ছড়ে, কেটে পরিবেশ চিনেছি। বরাবরের কলকাতার পিন কোডের আওতায় বড় হলেও বাড়ির আশপাশে বেশ খানিকটা সবুজ ছিল, এক দুটো পুকুর, প্রত্যেকের খানিকটা বাগান, নারকোল গাছ, আম, কাঁঠাল, নিদেন পক্ষে কামিনী, গন্ধরাজ বা টগরের ঝোপ। আর ছিল এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যে অনায়াস যাতায়াতের চোরা পথ। আমরা ছুটির দিনে বেরোতাম অরণ্যদেব সেজে, নানান দিন নানান অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি, কোনো দিন আবিষ্কার করেছি কামিনীর ঝোপে টুনটুনির বাসা, লোকচক্ষুর আড়ালে পড়ে থাকা ফাঁকা প্লটে ছোট্ট জলার মাঝে কলমির ডালপালার মধ্যে ডাহুকের ডিম। ওরা লম্বা পায়ে সারাদিন পোকামাকড় খুঁজে বেড়াত, আমরা শোবার ঘরের জানলা দিয়ে সারাবেলা দেখতাম। একবার ফেব্রুয়ারি মাস হবে, শীত কদিন হল হালকা হয়েছে, চিলেকোঠায় কার্ডবোর্ড বক্সের মধ্যে আস্তানা গাড়ল একজোড়া পেঁচা। রাতে তার ডাক শুনেছি দেখতে পারিনি স্পষ্ট, তাই একদিন যাদের বাড়ি তিনতলা সেখানে উঠে অপেক্ষা করতে লাগলাম কতক্ষণে ওদের দেখা পাই। এরকম বেশ কদিন অপেক্ষার পর, যেদিন দেখা মিলল চিনলাম ওটি লক্ষ্মী পেঁচা যাকে বলে বার্ন আউল।

মনে আছে একটা বাইনোকুলারের কী আবদার করেছিলাম বাবার কাছে। বাবা বলেছিলেন কী হবে!! আমি বলেছিলাম এই যে পাখি গুলো চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, নিয়মিত আসে বাসা বাঁধে ওদের ভালো করে দেখতে চাই। বাবা খানিক নিঃস্পৃহ হয়ে বলেছিলেন এ তো আজ থেকে না বহু দিন চলছে, আরও আসত আগে যখন বাড়ি হয়নি এতো, বাইপাস হয়নি, ঐ যে দেখছিস, হাউজিং ওখানে আগে একটা ঘাসবন ছিল – কত ছোট ছোট বাদামী পাখির ঝাঁক আসত। আমরা বাবা কাকার হাত ধরে দেখেছি। কত কাছ দিয়ে উড়ে যেত। আমি বিস্মিত হয়ে যেতাম।

সময় যত এগিয়েছে আমরা জমিগুলো সব একে একে ভরে যেতে দেখলাম, তারপর গেলো বাড়ির বাগান গুলো, কাটা পড়ল ফলের গাছগুলো, ঝোপঝাড়। এখন প্রায় সবার গ্যারেজ, একটা বাড়তি ঘর অথবা দোকান দিতে সেইসব অমূল্য বাগান হারিয়ে গেছে।

আমার ছেলে বড় হচ্ছে, অরণ্যদেব সাজার সুযোগ তেমন নেই। তবুও পাখিরা আছে। খুব ভোরে একটা দোয়েল শিস দিয়ে যায়, একটাই মাত্র অবশিষ্ট পাকুড় গাছে নীলকণ্ঠ বসন্তবৌরি বসে থাকে আর বেলা বাড়ার সাথে সাথে চড়ুই ছুটে বেড়ায়। আমার একটাই চিন্তা হয়, এদের বাসাগুলো কোথায়?? আদৌ কি ওরা বাসা বাঁধতে পারে আগের মত!! তাহলে কি খাবারের খোঁজে ওদের অনেকটা জার্নি করে আসতে হয় আমাদের ক্রমশ ঘিঞ্জি হয়ে আসা লোকালয়গুলোয়? একসাথে খানিকটা সবুজ তো আমাদের পার্ক গুলোতেও নেই, শুধুই বাহারি গাছপালার ভিড়! তবে কী ওরাও বাসস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলেছে! যারা পারছে না তারাই বেমালুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নগুলো ছেলেকে আরেকটু বড় হলে করব। ওরও তো শহর এটা, ওদেরও তো ভাবা উচিত! আমরা না হয় এইবার একটা বাইনোকুলার কিনে উপহার দিই ওদের সামনের জন্মদিনে।

উত্তরগুলো খুঁজুক নতুন প্রজন্ম তবেই না আমার অরণ্যদেব শৈশব পুনর্জন্ম লাভ করবে।

এই শহরের বুকে নতুন উদ্যোগ খুঁজে পাওয়া, হতেই পারে অন্যত্র? ছবি – লেখক

বসত করে কয়জনা

এই গল্পের নায়ক পাক্কা বিদেশি। নাম অ্যারন দানকেরটন, টগবগে বাইশ বছরের ছেলে যার ধ্যান জ্ঞান ডিজাইনিং এমন ডিজাইন যা পলকে সমাধান করতে পারে মানুষের

সমস্যা। শুধুই কী মানুষের, কখনো সখনো জীবজন্তুরও। একদিন জানলার ধারে বসে পেন্সিল আর পেপার নিয়ে সময় কাটাতে কাটাতে প্ল্যান করে ফেলল ছিন্নমূল চড়ুইদের নতুন ঠিকানার। এমনিতেই যুগের নিয়মে বদলে যাচ্ছে বাড়ি ঘরদোর, দুই ডানার সহনাগরিকদের ঠাই ক্রমশ কমে আসছে দিন দিন। খাতা পেন্সিলের খসড়া থেকে স্থানীয় ইটভাটার ফার্নেস ঘুরে অ্যারন ততদিনে জন্ম দিয়েছে চড়ুই পাখিদের জন্য নতুন এক কামরার ফ্ল্যাট। মুখে মুখে যা ফিরতে শুরু করলো বার্ড ব্রিক মানে। ভাবলে অবাক লাগে এর আগে অ্যারন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা সব কিছুই মনুষ্য স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে যুক্ত। শুধুমাত্র নৈতিক দায়বদ্ধতা আর সৃজনশীলতার জোরে অ্যারনের মতো ছেলেরা আশ্চর্য কিছু করে যায়।

এরপর শুরু হল প্রয়োগ, সেও নিতান্ত সাধারণ ফলো আপ ব্যাপার না বরঞ্চ অনেক কঠিন কাজ। মানুষকে আগ্রহী করে তোলার মতো চ্যালেঞ্জ নেওয়ার পালা। প্রথমে নিজের বাড়িতে, বন্ধুদের, স্কুলে, স্টেশনে যেখানেই দেওয়াল গাঁথার প্রয়োজন হয়েছে নতুন করে, ছুটে যাওয়া নিজের উদ্ভাবনা নিয়ে; যদি আগ্রহ নিয়ে মানুষ এগিয়ে আসেন! ধীরে ধীরে সাড়া মিলল, প্রথমে নিজের শহরে, পরে অন্যপ্রান্তে এমনকি অন্য দেশেও। আজ অ্যারনের নাম বেশ পরিচিত, বিশেষ করে শহুরে পাখিপ্রেমী যারা তাদের কাছে তো বটেই।

বর্তমানে পাখিদের খাবার যোগানের থেকে আবাসের অপ্রতুলতা অনেক বেশি বড় সমস্যা বলে ধরা হয়। যে কোনো উপায় বাসা বাধার উপযোগী ব্যবস্থা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান সূত্র হতে পারে। সেখানে অ্যারনের প্রয়াস কী আমাদেরও কিছু করতে উৎসাহ দেবে না।

সব শহরেই অ্যারনদের চাই। হ্যাঁ, প্রয়োগ ক্ষমতা চাই। আমরা ছবি তুলি, আলোচনা করি আর একটু এক ধাপ এগোলে পরে যদি এরকম কিছু একটা করে ফেলা যেত। নতুন ফ্ল্যাটগুলোর একটা দেওয়ালে বার্ড ব্রিক, মন্দ কি? আপনার নতুন ঘরের সাথে ওদেরও নতুন ঠিকানা। এইভাবেই নিজের ফুটপ্রিন্টটা সামান্য কমিয়ে নিয়ে, সবুজ উদ্যোগ করাই যায়, তাই না!

গাঁথনির ফাঁকে ফাঁকেঃ আমার ঘর কী তোমার বাসাও বটে!...ছবি – ডিজিন.কম

ভুল থেকে শেখা

ছবি, প্রতিচ্ছবির খেলা চলছে দিনরাত, কতটা কাছে, নিখুঁত আর অনবদ্য শিরোপা পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে এই চর্চায় পাখিদের কৌলীন্য কেউ কাড়তে পারবে না। কৌলীন্য না হয় থাকল, কিন্তু তাতেও তো সব রক্ষা হল না। মহার্ঘ প্রাণীটির বাসস্থানের দৈন্যতা তাতে ঢাকা পড়ে না। লেন্স না হলেও সেন্সে তা ধরা পড়ে যায়।

এই যেমন পারিয়ে মারিয়ে অনেকটা নসদিক যাওয়া গেল, বাসা মিললো ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক, এক দুজন ফ্ল্যাশও। চিরকালের জন্য বন্দি করে ফিরলাম কিছুটা পরিবেশ প্রেম। এমনিতেই সারা সপ্তাহের কর্পোরেট সত্তা শহরটার খবর বলতে তো নিউজপেপার আর গুগল। সপ্তাহের শেষের রিচার্জ অবশ্যই dslr টা।

হোক না ক্ষতি কি! তবে দেখার, পরে, চেনার পর আরো কাজ বাকি থেকে যায়। আমার এক মাস্টার মশাই শেখাতন, সব ঘটনার পেছনেই একটা how and why থাকে, এক্ষেত্রে পাখিটিকে ফ্রেমে বেঁধেই কাজ শেষ হয় না। বরঞ্চ জিজ্ঞাসা শুরু হয়।

কিরকম! ধরুন বাসস্থান, অর্থাৎ যেখানে পাখিদের দেখিদেখি ওটি কি তাদের জন্য স্বাভাবিক নাকি improvised? Improvised হলে স্ট্রেস কতটা গুরুতর? জানা প্রয়োজন, কারণ না জানলে নিশ্চুপে স্ট্রেস আরও বাড়বেবাড়বে আর আমরা অন্য কিছু নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকব।

আবার ধরা যাক শহরের বিচ্ছিন্ন সবুজ অবশেষ গুলোয় এখনো অনেক পাখিরা আসে, বাসা বাঁধে, নির্বিঘ্নে খায়, ঘোরে, কিন্তু তারা কতটা সুস্থ ভাবে আছে! যদি আমাদের এই সবুজ গুলো ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে!

একটু সবুজের অঙ্গীকারঃ কলকাতার উপকণ্ঠে তখনও ছিল পাখিদের রাজ্য, ক্রমেই কংক্রিট দখল করে নিল...ছবি – লেখক

ভারী dslr টা রেখে, গাইড বুকটা রেখে বসে ভাবা উচিত। শহুরে স্কুলের বাচ্চাগুলোকে জোর জবরদস্তি আপাত জৌলুসহীন শহরের কাক, চড়ুই, শালিক, পায়রা, বুলবুল, টুনটুনিরা কি খায়, কি দিয়ে বাসা বাঁধে, মানুষের থেকে , মাটির থেকে কতটা দুরত্বেদুরত্ব পছন্দ করে, তা জানতে হবে সবিস্তারে।

নইলে আগামী দিনে বাস্তুতন্ত্র বলতে আমরা হয়তো বুঝবো জনঅরণ্য, কোলাহল আর স্কোয়ার ফুট।